#আমি পদ্মজা পর্ব ৪৬

_____

১৯৯৬ সাল। ঘনকুয়াশার ধবল চাদর সরিয়ে প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁচের জানালার পর্দা সরাতেই এক টুকরো মিষ্টি পেলব রোদ্দুর পদ্মজার সুন্দর মুখশ্রীতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নীচ তলা থেকে মনার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আপামনি।'

মিষ্টি রোদের কোমল ছোঁয়া ত্যাগ করে ঘুরে দাঁড়াল পদ্মজা। আমির আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে লেপের ওম ছেড়ে উঠে বসল। দরজার বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল পদ্মজাকে। ধনুকের মতো বাঁকা শরীরে সবুজ সুতি শাড়ি। মাথায় লম্বা বেনুনি, চওড়া পিঠের ওপরে সাপের মতন দুলছে। পাতলা কোমর উন্মুক্ত। আমির চমৎকার করে হেসে ডাকল,'পদ্মবতী।' পদ্মজা ফিরে না তাকিয়েই জবাব

দিল,’অপেক্ষা করুন,আসছি।’
আমির মুখ গুমট করে বলল,’ইদানীং আমাকে একদমই পাত্তা দিচ্ছো না তুমি। বুড়ো হয়ে গেছি তো।’

ওপাশ থেকে আর সাড়া আসল না। আমির অলস শরীর টেনে নিয়ে বারান্দায় গেল। পদ্মজা বৈঠকখানায় এসে দেখে,মনা সোফায় পানের কৌটা নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। নয় বছরের মনা এখন চৌদ্ধ বছরের ছটফটে কিশোরী। পদ্মজা গম্ভীর স্বরে বলল,’ পান খাওয়ার অনুমতির জন্য ডেকেছিস?’
মনা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নত অবস্থায় রেখেই চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে পদ্মজাকে দেখল একবার। এরপর আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,’অনেকদিন খাই না। আপামনি একটা খেতে দাও না?’

মনা চাইলে লুকিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু সে পদ্মজাকে ডেকে অনুমতি চাইছে। পদ্মজা মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। সোফায় বসে প্রশ্ন করল,'পান কে দিয়েছে? আবার সাথে পানের কৌটাও!'
'আব্বা আসছিল।' ভীতু কণ্ঠে বলল মনা।
'কখন?'
'ভোরবেলা।'
'বাসায় আসেনি কেন?'
'কাজে যাচ্ছে তাই।'
'উনি এমনি এমনি কেন আনবেন পানের কৌটা? তুই স্কুল থেকে ফেরার পথে বস্তিতে গিয়েছিলি, তাই না?'

মনা জবাব দিল না। তার চুপ থাকা প্রমাণ করছে,পদ্মজার ধারণা সত্য। পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বলল,'একটা পান খাবি। কৌটাসহ বাকি পান,সুপারি রহমত চাচাকে দিয়ে তোদের

বস্তিতে পাঠিয়ে দেব।’
পদ্মজা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,’তুই নাকি গণিতে ফেইল করেছিস?’
পদ্মজার প্রশ্নে মনা চোরের মতো এদিকওদিক চোখের দৃষ্টি দৌড়াতে থাকল। পদ্মজা ধমকে উঠল,’বলছিস না কেন? আমি প্রতিদিন রাতে সময় নিয়ে তোকে গণিত বুঝিয়েছি। তবুও ফেইল করলি কী করে?’
মনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,’পরীক্ষার আগের দিন পড়িনি। পরীক্ষায় গিয়ে সব ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছিল।’
‘কেন পড়িসনি? সেদিন আমি অসুস্থ ছিলাম না? তাই আমি দুই তলায় ছিলাম নিচে একবারও আসতে পারিনি। এই সুযোগে পড়া রেখে টিভি দেখেছিলি তাই তো?’
মনা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। পদ্মজা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। বেহায়ার মতো

আবার স্বীকারও করছে,পড়া রেখে টিভি দেখেছে! ঢাকা আসার পরের বছরই মনাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল সে। এখন মনা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মাথায় বুদ্ধি বলতে নেই। সারাক্ষণ টিভি, টিভি আর টিভি! এতো পড়ানোর পরও কিছু মাথায় রাখতে পারে না। পদ্মজা বিরক্তি নিয়ে জায়গা ছাড়ল। শোবার ঘরে ঢুকতেই আমির আক্রমণ করে বসল। পদ্মজার কোমরের উন্মুক্ত অংশে হাত রাখতেই পদ্মজা 'উফ! ঠান্ডা।' বলে ছিটকে সরে গেল। আমির হতভম্ব হয়ে গেল। দুই পা এগোতেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রিনরিনে কণ্ঠে ধমক বেরিয়ে আসল,'একদম এগোবেন না। এই শীতের মধ্যে ভেজা হাতে ছুঁলেন কীভাবে? আচ্ছা,আপনি আমার কালো সোয়েটারটা দেখেছেন? পাচ্ছি না। শীতে জমে যাচ্ছি একদম।'
আমির কিছু বলল না। সে পদ্মজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা

এদিকওদিক তার কালো সোয়েটারটা খুঁজল। এরপর আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। বলল,'এভাবে সঙের মতো খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'
আমির কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। পদ্মজা পাশের ঘরে চলে গেল। কালো সোয়েটারটা খুঁজে বের করতেই হবে। এ সোয়েটারটা পরে সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমির টেলিফোন রেখে পদ্মজাকে ডেকে জানাল, সে বের হবে। জরুরি দরকার। পদ্মজা সোয়েটার খোঁজা রেখে তাড়াতাড়ি করে খাবার পরিবেশন করল। গরুর মাংস গরম করল। আমির খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিয়মমতো পদ্মজার কপালে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল। পদ্মজা তৈরি হয় রোকেয়া হলে যাওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে রোকেয়া হলের অনেক মেয়েকেই চিনে। আজ মনার স্কুল নেই। সে একাই বাসায়

থাকবে। পদ্মজা হলে যাচ্ছে এক ছোট বোনের সাথে দেখা করার জন্য। আমিরের তো কখনোই ছুটি নেই। নিজের ব্যবসা। যখন তখন কাজ পড়ে যায়।

রোকেয়া হলের চারপাশ সবুজ গাছে আবৃত। পদ্মজা গেইটের বাইরে গাড়ি রেখে এসেছে। হিম শীতল বাতাসে চোখজোড়া ঠান্ডায় জ্বলছে। তার পরনে বোরকা। মুখে নিকাব। রোকেয়া হলের 'ক' ভবনে এসে জানতে পারল যার খুঁজে সে এসেছে সে নেই। চারিদিক নিরিবিলি। প্রায় সবাই ক্যাম্পাসে। নির্জন পরিবেশে এমন ঠান্ডা বাতাস রোমাঞ্চকর অনুভূতি। রোকেয়া হলে এ নিয়ে অনেকবার এসেছে সে। পদ্মজা 'ক' ভবনের নিচ তলার শেষ মাথার কাছাকাছি অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তখন অতি সূক্ষ্ম একটা শব্দ কানে ভেসে আসে। পদ্মজা থমকে

দাঁড়াল। দুই পা পিছিয়ে চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করল। শব্দটা তীব্র হয়েছে! যেন কাছে কোথাও ধস্তাধস্তি হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকায়। একটা মেয়ের চাপা কান্নার শব্দ কর্ণকুহরে পৌঁছাতেই পদ্মজা দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো ছুটে আসে শেষ কক্ষের দরজার সামনে। পৌঁছেই দেখতে পেল অর্জুন এবং রাজু একটা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে কক্ষ থেকে বের করতে চাইছে। ক্যাম্পাসের ছাত্রসংগঠনের নেতা এরা। ছয় মাস হলো ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে এসেছে। আর এখনই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছে। পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে অর্জুন,রাজু তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। পদ্মজাকে দেখে মেয়েটা ছুটে আসতে চাইলে অর্জুন ধরে ফেলে। পদ্মজা বেশ শান্তভাবেই বলল,'ক্ষমতার অপব্যবহার করতে নেই। ছেড়ে দাও মেয়েটাকে।'

পদ্মজার কণ্ঠ মেয়েটা চিনতে পারল। অস্ফুটভাবে ডাকল,'পদ্ম আপা।'
এরপর বলল,'পদ্ম আপা,আমি মিঠি। পদ্ম আপা ওরা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।'
পদ্মজা ভালো করে খেয়াল করে চিনতে পারল মিঠিকে। অর্জুন মিঠির গালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মেরে রাজুকে বলল,'এরে ঘাড়ে উঠা। এই আপনি সরেন। মাঝে হাত ঢুকাবেন না। বিরক্ত করা একদম পছন্দ না আমার।'
পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল,'দেখো, মা জাতিকে এভাবে অপমান করতে নেই। হাতে ক্ষমতা পেয়েছো সৎভাবে চলো। সবার ভালোবাসা পাবে। এভাবে নিজেরা অন্যের ইজ্জত নষ্ট করছো সেই সাথে নিজেদের পাপী করছো।'
'এই ফুট এখান থেকে। নীতি কথা শোনাতে আসছে।'

‘ভালোভাবে বলছি,ভেজাল না করে ছেড়ে দাও। নারীকে নারীরূপে থাকতে দাও। শক্ত হতে বাধ্য করো না।’
অর্জুন রাগে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলল,’আর একটা কথা বললে জামাকাপড় খুলে মাঠে ছেড়ে দেব।’

কথাটা শেষ করে অর্জুন চোখের পলক ফেলতে পারল না। তার আগে পদ্মজার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় তার ফর্সা গালে। অর্জুন রক্তিম চোখে কিড়মিড় করে তাকায়। মিঠিকে ছেড়ে পদ্মজার গলায় চেপে ধরে। পদ্মজা সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। অর্জুন কোঁকিয়ে উঠল। অণ্ডকোষে দুই হাত রেখে বসে পড়ল। রাজু বিশ্রি গালিগালাজ করে পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে। পদ্মজা মেঝে থেকে ইট তুলে রাজুর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। মিঠি ভয়ে চোখ

খিঁচে ফেলে। রাজুর কপাল ফেটে রক্তের ধারা নামে। অর্জুন আকস্মিক তেড়ে এসে পদ্মজার নিকাব টেনে খুলে। ঘোলা চোখের ভয়ংকর চাহনি,রক্তজবার মতো ঠোঁটের কাঁপুনি অর্জুনের অন্তর কাঁপিয়ে তুলে। তবুও দমে থাকেনি। পদ্মজাকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। পদ্মজা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে অর্জুনের গলায় টান বসায়। এই দৃশ্য দেখে মিঠির শরীর কাঁপতে থাকে। অর্জুন চিৎকার করে বসে পড়ে। গলায় হাত দিয়ে দেখে গলাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। চামড়া ছিঁড়েছে শুধু। তার হৃৎপিণ্ড যেন মাত্রই মৃত্যু সাক্ষাৎ পেল। পদ্মজার অভিজ্ঞ হাত তার কলিজা শুকিয়ে দিয়েছে। মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা ছুরির রক্ত অর্জুনের গেঞ্জিতে মুছে বলল,'তোমাদের ভাগ্য ভালো পদ্মজার হাতে পড়েছো। হেমলতার হাতে পড়োনি।'

এরপর মিঠিকে প্রশ্ন করল,’আমার জানামতে তুমি ১ম বর্ষে আছো। আর হলে দ্বিতীয় তলায় থাকার কথা। এখানে আসলে কী করে?’
মিঠির ভয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল,’আমি গত কয়দিন অসুস্থ ছিলাম। ক্যাম্পাসে যেতে পারিনি। অর্জুন দাদা নাজমাকে দিয়ে আমাকে ডেকেছিল।’
‘ওমনি চলে এসেছো? কয়দিন আগে ৩য় বর্ষের একটা মেয়ের কী হাল হয়েছে
দেখোনি,শুনোনি? এরপরও এদের ডাকে সাড়া দিলে কেন?’
‘না দিয়েও উপায় নাই।’

পদ্মজা আর কিছু বলতে পারল না। মিঠিকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর নিকাব পরতে পরতে বলল,’এসব বেশিদিন সহ্য করা যায় না। মেয়েরা হলে এসে থাকে পড়াশোনার জন্য। আর এসব নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়।

তোমার চেনাজানা আরো যারা
মানসিক,শারিরীকভাবে ভুক্তভোগী আছে
সবার নামের তালিকা আমাকে দিতে পারবে?’
মিঠি জানতে চাইল,’কেন?
‘সবাইকে নিয়ে প্রশাসনের কাছে যাব। তাদের
নিরবতা আর মেনে নেব না। ক্যাম্পাসে আসার
পর থেকে নেতাদের অপকর্ম দেখছি।
থামানোর চেষ্টা করেছি। একজন,দুজন থামে
আরো দশজন বাড়ে। এইবার আমাদের
আন্দোলন করতে হবে।’
মিঠি মিনমিনিয়ে বলল,’কেউ ভয়ে আন্দোলন
করতে চায় না। অনেকবার দিন তারিখ ঠিক
হয়েছে শুনেছি। এরপর যাদের আসার কথা
ছিল তাদের মধ্যে আশি ভাগই আসতো না।
অনেককে বাসায় আক্রমণ করা হয়েছে।’
পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল।
সমাজে মেয়েরা এতো দূর্বল! তাদের দেহের
লুকায়িত আকর্ষণীয় ছন্দগুলো না থাকলে

হয়তো তারাও সাহসী হতো। ছন্দ হারানোর ভয় থাকত না। কাউকে ভয় পেতে হতো না।
পদ্মজা মিঠিকে বলল,'তুমি বরং কয়দিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসো। এখানে থাকা তোমার জন্য এখন বিপদজনক। আমি আগামীকাল গ্রামে যাচ্ছি। আমার আম্মার মৃত্যুবার্ষিকী। ছোট বোনের মেট্রিক পরীক্ষা দেড় মাস পর। আরেক বোনের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। দেড়-দুই মাসের মতো গ্রামে থাকব। এরপর এসে এই নেতাদের ব্যবস্থা করব। তোমাদের বর্ষের শিখা আছে না? বেশ সাহসী মেয়েটা। ওর মতো আরো কয়টা মেয়ে পাশে থাকলেই হবে। তুমি যাও এখন। দ্রুত বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো। যতক্ষণ এখানে আছো একা চলাফেরা করো না। শিখাও তো মনে হয় হলেই থাকে?'
'জি।'
'ওর সাথে থেকো।'
'কখনো কথা হয়নি।'

‘এখনতো ক্যাম্পাসে বোধহয়। আচ্ছা বিকেলে আমি আবার আসব। ওর সাথে কথা বলব। আমি আসছি এখন।’
‘পদ্ম আপা?’
পদ্মজা তাকাল। মিঠি পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ভেজাকণ্ঠে বলল,’অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।’
‘বাঁচার সংগ্রামে ভীতু হলে চলে না মিঠি।’
‘ভেবেছিলাম জীবনটা শেষ হয়েই গেল বুঝি।’
‘কখনো এমন ভাববে না। বিপদে সামর্থ্য মতো যা পারো করবে। শরীরের শক্তি নিশ্চয় কম নয়। মনের জোরটা কম। সেই জোরটা বাড়াবে। মনের জোর বাড়াতে টাকা লাগে না। কঠিন জীবন সহজ করে তোলার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়।’
মিঠি মাথা তুলে তাকাল। একটু সরে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল। এরপর বলল,’দ্রুত ফিরবে

পদ্ম আপা। আমরা আমাদের নিরাপত্তার যুদ্ধে নামব।’
পদ্মজা হেসে বলল,’ফিরব। দ্রুত ফিরব।’

গাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছে। বাড়ির নাম আগে ছিল,আমির ভিলা। বছর ঘুরতেই আমির বাড়ির নাম পাল্টে দিল,পদ্ম নীড়। পদ্মজা জানালার কাচ তুলে বাইরে তাকাল। রাস্তাঘাটে মানুষজন কম। ঠান্ডা বাতাস। সূর্যের আলোয় একদমই তেজ নেই। যেন থুড়থুড়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। পদ্মজা আকাশপানে তাকিয়ে তিনটা প্রিয় মুখকে খোঁজে। চোখ দুটি টলমল করে উঠে। কোথায় আছে তারা? আবার কবে হবে দেখা? পদ্মজা কাচ নামিয়ে দিল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

_____

নিস্তব্ধ বিকেল ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে

অলন্দপুরের আটপাড়া। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় নূপুরধ্বনিতে। পূর্ণার চঞ্চল কাদামাখা দুটি পা দৌড়ে ঢুকে মোড়ল বাড়ি। পায়ের নূপুরজোড়া রিনঝিন রিনঝিন সুর তুলে ছন্দে মেতেছে। পরনে লাল টুকটুকে শাড়ি। আঁচল কোমরে গোঁজা। শাড়ি গোড়ালির অনেক উপরে পরেছে। । বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠল,'বড় আম্মা। ও বড় আম্মা।'
বাসন্তী রান্নাঘর ছেড়ে দৌড়ে আসেন। হাতের চুড়িগুলো ঝনঝন করে উঠে। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। তাও কিঞ্চিৎ। পূর্ণাকে এভাবে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করলেন,'বাড়িতে ডাকাত পরছে?'
'আপার চিঠি।' পূর্ণা হাতের খামটা দেখিয়ে বলল।

আপার চিঠি শুনে প্রেমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সে পড়ছিল। ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা।

ষোড়শী মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সবার চেয়ে আলাদা হয়েছে। খুব ভীতু এবং লাজুক সে। পূর্ণা বড় বোন হয়ে সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর সে ঘরে বসে পড়ে,বাড়ির কাজ করে। স্কুলে যায়। পদ্মজার কথামতো প্রতিদিনের রুটিন অনুসরণ করে। সে বলল,'কী বলছে আপা? চিঠি দাও।'

পূর্ণা কপাল কুঁচকে বলল,'তোর পড়তে হবে না। বলছে,মাঘ মাসের ১৯ তারিখ আসছে। অনেকদিন থেকে যাবে।"
'আজ কত তারিখ?' প্রশ্ন করলেন বাসন্তী।
পূর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'১৯ শে মাঘ।'

বাসন্তীর চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বিস্ফোরিত কণ্ঠে বললেন,'আজই! বিকেল তো হয়ে গেছে।'

পূর্না অস্থির হয়ে বাসন্তীর কাছে দৌড়ে আসে। দুই হাতে ধরে করুণ স্বরে বলল,'তাড়াতাড়ি

সালোয়ার কামিজ বের করো আমার। এই রূপে দেখলে একদম মেরে ফেলবে আপা।’

বাসন্তী আরোও করুণ স্বরে বললেন,’মা, আমি আগে আমার রূপ পাল্টাই। তুমি তোমারটা খুঁজে নাও।’

কথা শেষ করেই বাসন্তী ঘরের দিকে যান। বুক দুরুদুরু কাঁপছে। পরনে ঝিলমিল, ঝিলমিল করছে টিয়া রঙের শাড়ি। দুই হাতে তিন ডজন চুড়ি। কপালে টিপ,ঠোঁটে লিপস্টিক। এ অবস্থায় পদ্মজা দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তিনি সাজগোজ পূর্ণার কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর পূর্ণার কথায়ই দুজন মিলে আবার শুরু করেছেন। পদ্মজা এক-দুই দিনের জন্য প্রতি শীতে বাড়ি আসে তখন সব রঙ-বেরঙের জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়। পূর্ণা চিঠি প্রেমার হাতে দিয়ে ঘরে যায়। ট্রাঙ্ক খুলে সাদা-কালো রঙের সালোয়ারকামিজ দ্রুত পরে

নেয়। হাতের চুড়ি খুলতে গিয়ে কয়টা ভেঙে যায়। অন্যবার দুই-তিন দিন আগে চিঠি আসে। আর আজ যেদিন পদ্মজা আসছে সেদিনই চিঠি আসতে হলো! দশ দিন আগে চিঠি পাঠিয়েছে পদ্মজা। ডাকঘর থেকেই দেরি করেছে। পূর্ণা মনে মনে ডাকঘরের কর্মচারীদের গালি দিয়ে চৌদ্ধ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। সে দ্রুত জুতা পরে বারান্দায় আসে। প্রেমাকে তাড়া দিল,'জলদি পানি নিয়ে আয়।'

প্রেমার বেশ লাগছে। সে মনেপ্রাণে দোয়া করছে,পদ্মজা এখুনি এসে যাক আর দেখুক পূর্ণার সাজগোজ। কিন্তু প্রকাশ্যে পূর্ণার আদেশ রক্ষার্থে কলসি নিয়ে কলপাড়ে গেল। পূর্ণা মনে মনে আয়তুল কুরসি পড়ছে! এই বুঝি পদ্মজা এসে গেলো! গতবার মার তো খেয়েছেই। তার সাথে পদ্মজা রাগ করে তিন মাস চিঠি লিখেনি। বাতাসের বেগে পাতায়

মড়মড় আওয়াজ হচ্ছে। আর পূর্ণার মনে হচ্ছে, এইতো তার রাগী আপা হেঁটে আসছে। নাহ পানির জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। পূর্ণা কলপাড়ে ছুটে যায়। কলসি থেকে পানি নিয়ে পায়ের কাদা,ঠোঁটের লিপস্টিক ধুয়ে ফেলে। কপালের টিপ খুলে কলপাড়ের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে। হাতের চুড়ি, গলার হার,কানের বড় বড় দুল ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে এসেছে। পায়ের দিকে আবার চোখ পড়তেই, সে আঁতকে উঠল। নূপুরজোড়া হাঁটার সময় অনেক আওয়াজ তুলে। এ রকম নূপুর পরা নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ। আবার দৌড়ে গেল ঘরে। দৌড়ার সময় বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। নূপুর দুটো খুলে ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে দিয়ে মাটিতে ধপ করে বসে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। বিড়বিড় করে বলল,'বাঁচা গেল!'

এরপর হাঁটুতে থুতুনি রেখে মিষ্টি করে হাসল। আজ তার আপা আসবে। তার জীবনের সবচেয়ে দামী এবং ভালোবাসার মানুষটা আসবে। ঈদের আনন্দের চেয়েও বেশি এই আনন্দ। পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে যায়। প্রায় বছর খানেক পর আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে সে। বাসন্তী সাদা রঙের শাড়ি পরেছেন। তাড়াহুড়ো করে এটা ওটা রাঁধছেন। পূর্ণা সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াল। বাসন্তী বললেন,'প্রান্তরে বল গিয়ে লাল রঙের দাগ দেয়া রাজহাঁসটা ধরতে।'

পূর্ণা চুলায় লাকড়ি আরেকটা দিয়ে লাহাড়ি ঘরের দিকে যায়। প্রান্তকে লাহাড়ি ঘরেই বেশি পাওয়া যায়। প্রেমা পদ্মজার জন্য হেমলতার ঘরটা গুছাচ্ছে।

চলবে....